

বিবিধ প্রবন্ধ

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

বিবিধ প্রবন্ধ

আমরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত—একটা বাণী প্রচারের জন্য। আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিবার জন্য গগনে সূর্য উদিত হয়, গন্ধ বিতরণের উদ্দেশ্যে বনমধ্যে কুসুমরাজি যদি বিকশিত হয়, অমৃতময় বারিদান করিতে তটিনী যদি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়—যৌবনের পূর্ণ আনন্দ ও ভরা প্রাণ লইয়া আমরাও মর্ত্যলোকে নামিয়াছি একটা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যে অজ্ঞাত গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে—ধ্যানের দ্বারা, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা।

যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে আমরা ভাসিয়া আসিয়াছি সকলকে আনন্দের আস্বাদ দিবার জন্য, কারণ আমরা আনন্দের স্বরূপ। আনন্দের মূর্ত বিগ্রহরূপে আমরা মর্ত্যে বিচরণ করিব। নিজের আনন্দে আমরা হাসিব—সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও মাতাইব। আমরা যেদিকে ফিরিব, নিরানন্দের অন্ধকার লজ্জায় পলায়ন করিবে, আমাদের প্রাণময় স্পর্শের প্রভাবে রোগ, শোক, তাপ দূর হইবে।

এই দুঃখসঙ্কুল বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দ-সাগরের বান ডাকিয়া আনিব।

আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য লইয়া আমরা আসিয়াছি। আমরা আসিয়াছি সৃষ্টি করিতে, কারণ—সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ। তনু, মন-প্রাণ, বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া আমরা সৃষ্টি করিব। নিজের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শিব আছে—তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব। আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দে আমরা বিভোর হইব, সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে।

কিন্তু আমাদের দেওয়ার শেষ নাই; কর্মেরও শেষ নাই, কারণ—

> "যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
> ফুরাবে না আর প্রাণ;
> এত কথা আছে এত গান আছে
> এত প্রাণ আছে মোর;
> এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
> প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"

অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অপরিমেয় তেজ ও অদম্য সাহস লইয়া আমরা আসিয়াছি—তাই আমাদের জীবনের স্রোত কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের পর্বতরাজি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক অথবা সমবেত মনুষ্য-জাতির প্রতিকূল শক্তি আমাদের আক্রমণ করুক,—আমাদের আনন্দময়ী গতি চিরকাল অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

আমাদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম আছে—সেই ধর্মই আমরা অনুসরণ করি। যাহা নূতন, যাহা সরস, যাহা অনাস্বাদিত—তাহারই উপাসক আমরা। আমরা আনিয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে। আমরা অতীত ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা সব সময়ে মানিতে প্রস্তুত নই। আমরা অনন্ত পথের যাত্রী বটে, কিন্তু আমরা অচেনা পথই ভালবাসি—অজানা ভবিষ্যৎ আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই "the right to make blunders" অর্থাৎ "ভুল করিবার অধিকার"। তাই আমাদের স্বভাবের প্রতি সকলের সহানুভূতি নাই, আমরা অনেকের নিকট সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া।

ইহাতেই আমাদের আনন্দ; এখানেই আমাদের গর্ব! যৌবন সর্বকালে সর্বদেশে সৃষ্টি-ছাড়া ও লক্ষ্মীহারা। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি—বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্যন্ত অবসর আমাদের নাই। ভুল করি, ভ্রমে পড়ি, আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাৎপদ হই না। আমাদের তান্ডবলীলার অন্ত নাই, কারণ—আমরা অবিরামগতি।

আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সংকীর্ণতা—সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কন্টকশূন্য রাখা যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।

মনুষ্য জীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য। সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা চাই—সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা—যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুগে যুগে আমরা হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি—সে স্বাধীনতা সর্বতোমুখী! জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক, আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।

অনাদিকাল হইতে আমরা মুক্তির সংগীত গাহিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমরা যে কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠি সে ক্রন্দন শুধু পার্থিব বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য। শৈশবে ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র বল থাকে কিন্তু যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে বাহু ও বুদ্ধি আমাদের সহায় হয়। আর এই বুদ্ধি ও বাহুর সাহায্যে আমরা কি না করিয়াছি,—ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিসর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রুশিয়া, চীন, জাপান, হিন্দুস্থান—যে কোন দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখ—দেখিবে যে ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কীর্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের সাহায্যে সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আবার আমাদেরই অঙ্গুলিসঙ্কেতে সভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন। আমরা একদিকে প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রুরূপে তাজমহল যেমন নির্মাণ করিয়াছি, অপরদিকে রক্তস্রোতে ধরণীবক্ষও রঞ্জিত করিয়াছি। আমাদের সমবেত শক্তি লইয়া সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে; আবার রুদ্র করালমূর্তি ধারণ করিয়া আমরা যখন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছি তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে।

এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম চিনিয়াছি। এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা, সব চেয়ে বড় আশা—তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে—তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে। এই যে তরুণের আন্দোলন—এটা যেমন সর্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীর সকল দেশে বিশেষতঃ যেখানে বার্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়াছে, তরুণ সম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন্ দিব্য আলোকে পৃথিবীকে ইহারা উদ্ভাসিত করিবে তাহা কে বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠো, জাগো, ঊষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে!

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

বাঙ্গালীর অধঃপতন

আমি আজ একটা খুব বড় দুঃখের কথা বলবার জন্য কলম ধরেছি। এ দুঃখটা হয়ত অনেকের কাছে কাল্পনিক—কিন্তু আমার ক্ষুদ্র প্রাণের পক্ষে এ দুঃখটা সত্য ও গভীর।

গয়াতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির অধিবেশনে কার্যকরী সমিতি (Working Committee) গঠনের কথা যখন উত্থাপিত হয়, তখন বাঙ্গলাদেশ থেকে কাকে নির্বাচন করা হবে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। পূর্বরীতি অনুসারে যে প্রদেশের লোক সভাপতি হয় সেই প্রদেশ থেকে অন্তত পক্ষে একজন সম্পাদক হবার কথা। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও শাসমলের নাম সম্পাদক পদের জন্য প্রস্তাবিত হয়, কিন্তু তাঁরা ঐপদ গ্রহণ করতে রাজী হন না। তারপর বাঙ্গলাদেশের পরিবর্তনবিরোধীদের (No Changer) মধ্যে কাহাকেও সম্পাদক করা হয় না। পরিবর্তনবিরোধীগণও এ বিষয়ে এতদূর নিশ্চেষ্ট ও নিরপেক্ষ ছিলেন যে কার্যকরী সমিতিতে একজন বাঙ্গালীও সভ্যরূপে নির্বাচিত হন না। তার ফলে পরিবর্তনবিরোধীদের দলে নিখিল ভারতীয় কাজে বাঙ্গালীর এখন কোনও স্থানই নাই।

ব্যাপারটা দেখে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও নিখিল ভারতীয় কাজে বাঙ্গালীর নাম লুপ্ত দেখতে আমরা চাই নি। বাঙ্গলাদেশে কি এমন কোন সভ্য ছিলেন না যিনি কার্যকরী সমিতির সভ্য হবার উপযুক্ত বা যিনি ঐ সমিতির সভ্য হতে পারতেন? যদি ছিলেন, তবে পরিবর্তনবিরোধীগণ তাঁকে উপেক্ষা করে নিজেদের এবং বাঙ্গালী জাতির মর্যাদাহানি ঘটালেন কেন? যদি এমন কোন ব্যক্তি না ছিলেন, তবে এই দল কোন্ সাহসে দেশবন্ধুর মত নেতার বিরুদ্ধাচরণ করে বাঙ্গলাদেশে কংগ্রেসের কাজ চালাবার ভরসা করেছিলেন? যে নিখিল ভারতীয় কার্যকরী সমিতিতে এক সময় বাঙ্গালীর গৌরবময় স্থান ছিল, সেই সমিতিতে আজ একজন বাঙ্গালীও নাই। বাঙ্গালীর এই অধঃপতনের জন্য কি পরিবর্তনবিরোধীগণ দায়ী নন!

ভূতপূর্ব আইন ব্যবসায়ীদের সাহায্যকল্পে শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজের টাকাতে একটা "ফণ্ড" করা হয়; সেই 'ফণ্ডের' নাম দেওয়া হয় "বাজাজ ফণ্ড" (কংগ্রেস ফণ্ড বা তিলক স্বরাজ্য ফণ্ড নয়)। এই সাহায্য বিতরণের জন্য প্রত্যেক প্রদেশ থেকে একজন লোক মনোনীত হন। বাঙ্গলার ভার শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের উপর অর্পিত হয়। সেনগুপ্ত মহাশয় যখন ঐ পদ ত্যাগ করেন, তখন পরিবর্তন-বিরোধীদের দলে এমন একজন লোক পাওয়া গেল না যিনি ঐ ভার গ্রহণ করতে পারেন। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে লোক পাওয়া গেল কিন্তু বাঙ্গলার ভাগ্যবিধাতা হলেন শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ। সাহায্য বিতরণের প্রণালীতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বলে কয়েকজন অসহযোগী উকিল সাহায্য নেওয়া বন্ধ করলেন। কিন্তু পরের চাকরী করলে বা ইংরেজের আদালতে উকিল হ'লে মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে না ব'লে যাঁরা একদিন অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেক কর্মী শ্রীযুক্ত বাজাজের দেওয়া টাকা হাত পেতে নিলেন।

গয়া কংগ্রেসের পর পরিবর্তন-বিরোধীগণ কোমর বেঁধে কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সুদূর তামিল প্রদেশ, গুজরাট, যুক্ত-প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ থেকে নেতৃবর্গকে ডেকে এনে বাঙ্গলাদেশের প্রচারকার্য চালাতে হল। বোধ করি পরিবর্তন-বিরোধীদের এমন সামর্থ্য ছিল না যে তাঁরা নিজেদের শক্তির বলে কাজটা করেন। অ-বাঙ্গালী নেতারা যে টাকা তুললেন তা প্রধানতঃ অ-বাঙ্গালীদের কাছ থেকে। বঙ্গবাসীরা এই প্রচারকার্যের প্রহসন দেখে হাসতে লাগলেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—"Stands Bengal where she was"?

অধঃপতনের শেষ এখনও হয় নি। বাঙ্গালীর কাছে আর কুমিল্লার তুলোর আদর নেই। বেশী দর দিয়ে দেড় টাকা সের হিসাবে ওয়ার্দা থেকে তুলো আনতে হবে, কারণ ওয়ার্দার তুলোর মালিক শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ এখন বাঙ্গলার—শুধু বাঙ্গলার কেন, সমগ্র ভারতের ভাগ্যবিধাতা। শ্রীযুক্ত বাজাজের তুলো আমরা বেশী দাম দিয়ে ক্রয় করি—তাঁর

দেওয়া টাকা আমরা দানস্বরূপ গ্রহণ করি। এরপর যদি তাঁর গুণ গাইতে আমরা আরম্ভ করি—তবে সে অপরাধ কি আমাদের?

সেদিন কাগজে দেখলাম নিখিল ভারতীয় কার্যকরী সমিতি থেকে বাঙ্গলা দেশের কয়েকটা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হয়েছে। আমরা এতদিন জানতাম সাহায্য বিতরণের ভার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির উপর ন্যস্ত আছে। কার্যকরী সমিতি তাঁদের দেয় টাকা। প্রাদেশিক সমিতির হাতে দিলে প্রাদেশিক সমিতি ঐ টাকা ব্যক্তিবিশেষকে বা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে ভাগ করে দিবেন। কিন্তু এখন দেখছি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির ন্যায্য অধিকার কার্যকরী সমিতি আর মানতে চান না। কার্যকরী সমিতিতে একজন বাঙ্গালী সভ্যও নাই যে এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদ করেন। ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে পরিবর্তন-বিরোধীদের কৃপায় নিখিল ভারতে আজ বাঙ্গালীর কোন স্থান নাই।

কার্যকরী সমিতি বাঙ্গলা দেশের কর্মীদের সাহায্যের নিমিত্ত চৌদ্দ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। এই টাকা বিতরণ করবেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির বা ঐ সমিতির সভাপতির এ বিষয়ে কোনও হাত নাই। পরিবর্তন-বিরোধীদের মধ্যে গণতন্ত্রবাদের যে সব পুরোহিত আছেন তাঁরা গণতন্ত্রের এরূপ বিচিত্র অভিনয় দেখে কি মনে করেছেন তা আমরা বলতে পারি না। এই চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয়ের ভার যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের হাতে ন্যস্ত হয়েছে এবং এ বিষয়ে যে অন্য কাহারও অধিকার নাই এ কথা প্রফুল্লবাবু বরিশালে জনসভায় বলেছেন।

একদিন মনে হত শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু সেদিন ঘুচে গেছে। অল্পদিন পূর্বে দিল্লীতে মিটমাটের একটা প্রস্তাব হয়। সেখানে শ্রীযুক্ত রাজা-গোপালাচারী, মোয়াজ্জেম আলি, আনসার মাহমুদ ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সম্মত হয়ে বলেন যে কংগ্রেসের তরফ থেকে কাউন্সিল প্রবেশ করা যেতে পারে। মিটমাট এক রকম হয়ে গেছল শুধু শ্রীযমুনালাল বাজাজ ও বল্লভভাই প্যাটেলের মত নেওয়া হয় নি। রাজাগোপালা-চারী মহাশয় বোম্বাইয়ের দিকে রওনা হলেন তাঁদের মত জানবার জন্য। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্যাটেল ও বাজাজ রাজী হলেন না বলে মিটমাট আর সম্ভব হল না। এখন অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে তেত্রিশ কোটি নরনারীর সুখ দুঃখ নির্ভর করছে শ্রীযুক্ত বাজাজ ও প্যাটেলের উপর।

অধঃপতন আর কতদূর গড়াবে তা শুধু ভগবানই জানেন। বাঙ্গালী নিজেকে সস্তা দরে বিক্রয় করে একগালে চূণ আর একগালে কালি মেখে বসে আছে। বাঙ্গালীর অধঃপতন চরমে পৌঁছতে কত দেরী আছে তা আমরা জানি না। কে জানে কত দুঃখ, কত লজ্জা বাঙ্গালীর কপালে আছে? তার এখনও সময় আছে প্রতিকার করবার। বাঙ্গালীর গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে। নিখিল ভারতীয় কাজে বাঙ্গালীর যে স্থান ছিল সে স্থান ফিরে পেতে হবে। পরিবর্তন-বিরোধীরা বাঙ্গালীর নাম ভারতের সম্মুখে কলঙ্কিত করেছেন, এ কলঙ্ক আমাদের ঘোচাতে হবে। ভারতকে যেমন বাঁচাতে হবে, বাঙ্গলার নামও সেরূপ চিরকালের জন্য উজ্জ্বল রাখতে হবে। বাঙ্গলার নষ্ট খ্যাতি ও লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের কাজে যিনি সহায়তা করবেন বাঙ্গালী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।*

---

*২৫শে মে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০) 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ।

মান্দালয় থেকে বার্তা

"কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে"র প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আমি এটিকে অভিনন্দন জানাই। আরও ভাল করার যদিও অবকাশ আছে, তবু এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই যে এক বছরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্ম নথিবদ্ধ করার গর্ব এটি করতে পারে। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পত্রিকাটির কাজ চালানো হয়েছে, এবং তার জন্য সম্পাদক প্রশংসার্হ। অগ্রদূতের কাজ সর্বদাই পরিশ্রমের এবং স্বীয় ক্ষেত্রে এই 'গেজেট' অগ্রদূত-ই বটে। আমার আশা, অনতিদূর ভবিষ্যতে এই 'গেজেট', অন্যান্য দেশের অগ্রগণ্য কর্পোরেশনের পুস্তকাদির পাশাপাশি চলতে সক্ষম হবে এবং অন্যান্য ভারতীয় পৌরসভার কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠবে। বর্তমানের কৃতিত্ব সেই ভাবী পরিপূর্ণতা লাভের আশাব্যঞ্জক পূর্ব-সূচনা। পৌরশাসনের সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সচেতনতা এবং করদাতা ও পৌর-শাসকদের সহযোগিতার উপর। আমার বিশ্বাস এই 'গেজেট' নাগরিকবৃন্দের সচেতনতা জাগ্রত করতে সাহায্য করতে এবং উভয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হবে। এটি নাগরিকবৃন্দকে পৌরসভার কাজ ও সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত রাখবে এবং তাদের কাছ থেকে উন্নতির উপায় সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করবে। নতুন বছরে যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে 'গেজেটে'র, আলোচনা করা উচিত সেগুলি হলঃ—

(১) জলনিষ্কাশন-ব্যবস্থা এবং বিদ্যাধরী (২) রাস্তার আলোর কন্ট্রাক্ট (৩) সংযোজিত এলাকাগুলির উন্নতিসাধন (৪) Motor Vehicles বিভাগ ও পৌর রেল-ব্যবস্থার পুনর্গঠন (৫) নির্বাচিত এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (৬) মহামারী প্রতিরোধ ও কলকাতার জন্য একটি সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল (৭) বস্তি-উন্নয়ন ও দরিদ্র মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ (৮) দুগ্ধ-সরবরাহ (৯) বার্ধক্যগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসালয় এবং ভিক্ষাবৃত্তির বিলোপ (১০) বেশ্যালয়গুলির প্রশ্ন (১১) পৌর মিউজিয়াম ও রিসার্চ ব্যুরো (১২) পৌর রঙ্গমঞ্চ (১৩) শহর-পরিকল্পনা এবং উন্নতিসাধনের পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য উন্নয়ন-কমিটি (১৪) ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সমস্যা।*

নভেম্বর ১১, ১৯২৫

সুভাষচন্দ্র বসু

---

*ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে মান্দালয় জেল থেকে পাঠানো বার্তা।

দেশের ডাক

দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী বিদেশীকে ভারতের বক্ষে প্রবেশের পথ দেখিয়েছিল। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে করতে হবে। বাঙ্গলার নরনারীকে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। কি উপায়ে এই কার্য সুসম্পন্ন হতে পারে এটাই বাঙ্গলার সর্বপ্রধান সমস্যা।

জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্তক মাহাত্মা গান্ধী অবাঙ্গালী হলেও এই আন্দোলন সম্পর্কীয় কাজ বাঙ্গলাদেশে যে রকম প্রসার লাভ করেছে, অন্য কোনও প্রদেশে সে রকম করেনি। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ দেখার পর আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে অগ্রণী না হলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে, স্বরাজ-সংগ্রামে বাঙ্গলার স্থান সর্বাগ্রে। আমার মনের মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার গুরুভার প্রধানতঃ বাঙ্গালীকেই বহন করতে হবে। অনেকে দুঃখ করে থাকেন, বাঙ্গালী মারোয়াড়ী বা ভাটিয়া হলো না কেন? আমি কিন্তু প্রার্থনা করি, বাঙ্গালী যেন চিরকালই বাঙ্গালীই থাকে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ"। আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি। বাঙ্গালীর পক্ষে স্বধর্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ। ভগবান আমাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে, কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন। অর্থের জন্য লালায়িত হয়ে যদি প্রাণের সম্পদ হারাতে হয় তবে অর্থে আমাদের প্রয়োজন নেই।

বাঙ্গালীকে এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষ কেন—পৃথিবীতে, তার একটা স্থান আছে—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত গড়ে তুলতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংগীত, শিল্প-কলা, শৌর্য-বীর্য, ক্রীড়া-নৈপুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য—এই সবের ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীকে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করবার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় (cultural synthesis) করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙ্গালীর আছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, বাঙ্গালীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষা, দীক্ষা, স্বভাব-চরিত্র এই সবের মধ্যে বাঙ্গালীর সেই বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সবুজ শ্যামল ক্ষেত্র ও তালগাছঘেরা পুষ্করিণী—এই সবের মধ্যে কি একটা বৈশিষ্ট্য নাই? আর প্রকৃতি দেবীর এই বৈশিষ্ট্য কি বাঙ্গালীর চরিত্রে একটা বিশিষ্টতা প্রদান করেনি? এমন নরম মাটিতে জন্মেছে বলেই বাঙ্গালীর এমন সরল প্রাণ! প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে বলেই বাঙ্গালী সুন্দরের উপাসক হয়েছে। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির অন্নজল সেবন করেই বাঙ্গালী কাব্যে ও সাহিত্যে এমন অপূর্ব সৃষ্টি-কৌশল দেখাতে পেরেছে।

গত দুই তিন বৎসর ধরে বাঙ্গলা দেশে যে জাগরণের বন্যা এসেছিল সে বন্যা এখন ভাঁটার দিকে চলেছে বটে, কিন্তু জোয়ারের আর বেশী বিলম্ব নাই। বাঙ্গলা দেশে জাতীয়-তার স্রোতে আবার প্রবল বন্যা আসবে। সে বন্যার স্পর্শে বাঙ্গলার প্রাণ আবার জেগে উঠবে। বাঙ্গালী সর্বস্ব পণ করে আবার স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে উঠবে; দেশ আবার স্বাধীনতা লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হবে।

এই নব জাগরণের স্বরূপ কি হবে তা' কে বলতে পারে? এই নব যজ্ঞের পুরোহিত কে-হবে তা' কে বলতে পারে? যে ভাগ্যবান পুরুষ এই যজ্ঞের পৌরোহিত্য-ব্রত গ্রহণ করবেন তিনি এখন কোথায় বা কিরূপ সাধনায় মগ্ন আছেন তা' কে বলতে পারে? এই আন্দোলনের নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধী গ্রহণ করবেন অথবা কোনও নূতন মনীষী তাঁর আসনে বসবেন—তা' আমরা জানি না।

এই সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য বসে থাকলে চলবে না। এই নব জাগরণের জন্য এখন থেকে আমাদের সকলকে প্রস্তুত হতে হবে। ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, কর্ম, ত্যাগ, ভোগ—এই সবের মাঝখান দিয়ে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে—যাতে ডাক এলে আমরা সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত থাকব।

বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার—তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ভগবান যদি করেন, তোমরা যদি শেষ পর্যন্ত জীবিত থাক—তবে স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ করতে পারবে। আর যদি স্বদেশসেবার পুণ্য প্রচেষ্টায় ইহ-লীলা সম্বরণ করতে হয়, তবে মৃত্যুর পর স্বর্গের দ্বার তোমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে। তোমরা যদি প্রকৃত বীর সন্তান হও তবে এগিয়ে এসো।

হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই ত দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। আজ এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের দিনে স্বাধীনতার বাণী যখন চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে তখন কি তোমরাই ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরাই ত চিরকাল "জীবনমৃত্যু"কে "পায়ের ভৃত্য" করে রেখেছ—তোমরাই ত সকল দেশে আত্মদানের পুণ্য ভিত্তির উপর জাতীয় মন্দির নির্মাণ করেছ—তোমরাই ত যাবতীয় দুঃখ অত্যাচার সানন্দে গ্রহণ করে প্রতিদানে সেবা ও ভক্তি অর্পণ করেছ। লাভের আকাঙ্ক্ষা তোমরা রাখনি, ভয় তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বীর সৈনিকের মত তোমরা হাসতে হাসতে মরণকে আলিঙ্গন করেছ। তোমাদের শৌর্য, বীর্য ও চরিত্রবল দেখে মাতা বসুন্ধরা তোমাদের শুভ্র ললাটে জয়টীকা পরিয়ে দিয়েছেন।

ওগো বাঙ্গলার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশ-সেবার পুণ্য যজ্ঞে আজি আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, ছুটে এসো। চারিদিকে মায়ের মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছে। ঐ যে পূর্বগগনে ভারতের ভাগ্যদেবতা তরুণ তপনের রূপে দেখা দিয়েছেন। স্বাধীনতার পুণ্য আলোক পেয়ে চীন, জাপান, তুরস্ক, মিসর পর্যন্ত আজ জগৎ-সভায় উন্নতশিরে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমরা কি এখনও মোহবশে ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরা ওঠো, জাগো, আর বিলম্ব করলে চলবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী বণিককে গৃহপ্রবেশের পথ দেখিয়ে তোমাদের পূর্বপুরুষরা যে পাপ সঞ্চয় করে গেছেন, এই বিংশ শতাব্দীতে তোমাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ভারতের নব-জাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ মুক্তির জন্য হাহাকার করছে। তাই বলছি, তোমরা সকলে এসো, ভ্রাতৃবন্ধনের "রাখি" পরিধান করে, মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা করো যে, মায়ের কালিমা তোমরা ঘুচাবে, ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে এবং হৃতসর্বস্বা ভারতলক্ষ্মীর লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করবে।

১১ই পৌষ, ১৩৩২

দেশবন্ধু স্মৃতি

মান্দালয় জেল
২০।২।২৬

জনসাধারণের পাঠের জন্য স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু লেখার মত সাহস আমার হয় নাই। কখনও হইবে কি না জানি না। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ এত গভীর রকমের ছিল যে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও নিকট তাঁহার বিষয় কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয় না। অধিকন্তু তিনি এত বড় ছিলেন এবং আমার হিসাবে আমি এত ক্ষুদ্র যে আমার সর্বদা মনে হয় যে, তাঁহার প্রতিভা কত সর্বতোমুখী, হৃদয় কিরূপ উদার ও চরিত্র কত মহান্ ছিল তাহা আজ পর্যন্ত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এরূপ অবস্থায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয়, ক্ষীণ চিন্তাশক্তি ও দীন ভাষার সাহায্যে সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবে ইচ্ছা ও সামর্থ্য না থাকিলেও বন্ধুর অনুরোধে অনেক কাজ এ জীবনে করিতে হয়—তাই আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে আমার এই প্রয়াস। দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষভাবে যতটুকু জানি এবং গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার জীবনের ও তাঁহার পুণ্যময় কর্মের গূঢ় অর্থ আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিতে গেলেও একটি পুস্তক হইয়া পড়িবে। অত কথা লিখিবার মত ক্ষমতা বা মনের অবস্থা আমার নাই, এই জন্য বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত আমি মাত্র কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

দেশবন্ধুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সকল কথা আমি অবগত নই। জীবনচরিতের মধ্যে যে সব কথা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় আমি জানি না। তাঁহার জীবনের মাত্র তিন বৎসর কাল আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হইয়া তাঁহার কাজ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেও চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিতে পারিতাম, কিন্তু চোখ থাকিতে কি আমরা চোখের মূল্য বুঝি? বিশেষতঃ দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অন্ততঃ আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিবেন এবং তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মর্ত্যলোকের কর্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন না। দেশবন্ধু নিজের কোষ্ঠীকে খুব বিশ্বাস করিতেন। আমি অবিশ্বাসী হইলেও তাঁহার বিশ্বাস যে আমার মনের উপর সংক্রামক প্রভাব বিস্তার করে নাই, এ-কথা বলিতে পারি না। আমার যতদূর স্মরণ আছে তিনি বহুবার আমায় বলিয়াছেন যে, সমুদ্রপারে দুই বৎসর কারাবাস তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে। কারাবাসের অবসানে তিনি সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করিবেন; কর্তৃপক্ষের সহিত মিটমাট হইবে এবং তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইবেন ; তারপর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। সে সময়ে আমি বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সহিত সমুদ্রপারে যাইতে আমিও প্রস্তুত। সত্য কথা বলিতে কি, সমুদ্রপারে আসার পর তাঁহার কোষ্ঠীর কথা স্মরণ করিয়া আমার মনে সর্বদা আশঙ্কা হইত—পাছে তাঁহাকেও আসিতে হয়, কিন্তু সে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা শতগুণে দারুণ দুর্ভাগ্য বাঙ্গলার, তথা ভারতের ভাগ্যে ঘটিল।

* * *

দেশবন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। আরোগ্য লাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাইবার ভরসায় তিনি সিমলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। আমাকে দেখিতে তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দুইবার আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমার বহরমপুর জেলে বদলী হইবার পূর্বে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধুলো লইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না।" তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সহিত বলিলেন, "না, আমি তোমাদের

শিগ্‌গির খলাস করে আনছি।” হায়, তখন কে জানিত যে, ইহজীবনে আর তাঁহার দর্শন পাইব না? সেই সাক্ষাতের প্রত্যেক ঘটনাটি, প্রত্যেক দৃশ্যটি, প্রত্যেক ভাষাটি পর্যন্ত আমার মানসপটে চিত্রের ন্যায় আজও অঙ্কিত আছে এবং বোধ করি, চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার সেই শেষ স্মৃতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কি, অনেকে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে; সুতরাং তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না। যাহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন। কত বিভিন্ন রকমের লোক তাঁহার হৃদয়ের টানে নিকটে আসিত এবং জীবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত তাঁহার প্রভাব ছিল! সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় এই বিপুল জনসমাজে তিনি চারিদিক হইতে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন এরূপ কত দৃষ্টান্ত এখন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। যাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাহাদের উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কি না করিতে প্রস্তুত ছিলেন? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না—এ-কথা একশো বার সত্য। দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁহার অনুচরবর্গ এবং তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহার আদেশে কি না করিতে পারেন? কোনও ত্যাগ, কোনও কষ্ট, কোনও পরিশ্রম কি তাহাদের বিচলিত করিতে পারিত? অবশ্য জীবনদানের পরীক্ষা কোনও দিন হয় নাই—কিন্তু সে কথা বাদ দিলে* বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার কাজ করিতে গিয়া সানন্দে সকলপ্রকার দুঃখ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাতে গৌরব অনুভব করিয়াছিল। দেশবন্ধুও জানিতেন যে, তাঁহার অহিংসা-সংগ্রামে তাঁহার এমন কতকগুলি সৈনিক আছে যাহাদের উপর তিনি সর্বাবস্থায় নির্ভর করিতে পারেন। আজ আমি গর্বের সহিত বলিতে পারি দেশবন্ধুর পুণ্যজীবনের শেষদিবস পর্যন্ত তাঁহার শান্তিসেনা অটল অচলভাবে সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে দেশবন্ধুর সুসংযত, কর্তব্যপরায়ণ, নির্ভীক অনুচরবৃন্দকে দেখিয়া অনেক তথাকথিত জননায়ক ঈর্ষাপরায়ণ হইতেন, তাঁহারাও হয়তো মনে মনে ঐরূপ অনুচরবর্গ পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু মূল্য দিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। সহকর্মী বা অনুচরকে ভাল না বাসিতে পারিলে বিনিময়ে তাহার প্রাণ পাওয়া যায় না। সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁহার বাড়ী সাধারণের সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বত্র—এমন কি তাঁহার শয়নপ্রকোষ্ঠেও সকলের গতিবিধি ছিল। তাঁহার অন্তরের এবং বাহিরের সম্পদের উপর সকলের দাবি ছিল। তিনি তাঁহার অনুচরবৃন্দকে যে শুধু ভালবাসিতেন তাহা নয়, তাঁহাদের জন্য লাঞ্ছনা সহিতেও প্রস্তুত ছিলেন। একদিন তাঁহার একজন নিকটআত্মীয় তাঁহার কোনও সহকর্মীর দোষ ও ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "I hate him"—আমি তাকে ঘৃণা করি। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলেন, “আমার মুস্কিল এই যে আমি তাকে ঘৃণা করিতে পারি না।” ইহা ব্যতীত বহিরঙ্গ লোকদের সহিত তাঁহার সহকর্মীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে অনেক ঝগড়া-বিবাদ করিতে হইত। এইরূপ বিবাদের সময় আমি স্বয়ং কয়েকবার উপস্থিত ছিলাম এবং আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার অনুচরবর্গের প্রতি তাঁহার কত গভীর বেদনা, তাহাদিগকে সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার কত লাঞ্ছনা!

যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন না তাঁহারা দেশবন্ধুর সঙ্ঘ গঠনের অপূর্ব শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইতেন—হইবারও কথা। কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। আমি এস্থলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, তিনি যে পর্বতের ন্যায় অটল সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল নায়ক ও অনুচরবর্গের

*তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে ও কংগ্রেসের কাজ করিতে করিতে কয়েকজনের দেহত্যাগও ঘটিয়াছিল।

মধ্যে প্রাণের সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোষ-গুণ-নির্বিশেষে, ভালবাসিবার ক্ষমতার সাহায্যে এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলের দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পন্থী ও রুচির লোকদিগকে একত্র চালাইতে পারিতেন। তাঁহার দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন অথবা তাঁহার মত পোষণ করেন না এরূপ বহুলোক গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

অনেক তথাকথিত জননায়ক স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, দেশবন্ধুর অনুচরবর্গ বা সহকর্মীগণ দাসত্বপরায়ণ ছিলেন। দেশবন্ধুর মন্ত্রণাগৃহে যাঁহারা কখনও উপস্থিত ছিলেন তাঁহার এ-কথা আদৌ সমর্থন করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। আলোচনা ও পরামর্শের সময়ে যাহারা নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিল, তাহাদিগকে আমি কি করিয়া দাসত্বপরায়ণ বলি? অধিকন্তু আলোচনার সময় নায়কের সহিত অনুচরবর্গের প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হইত, দেশবন্ধু আলোচনার সময় কখনও কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টবাদীর উপর তিনি কোনও দিন মনে মনে বিরক্ত হইতেন না। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল যে, যাহারা বেশী আপত্তি তুলিত তাহাদের কথা তিনি বেশী শুনিতেন। তবে এ কথা সত্য যে, মতভেদ হইলেও তাঁহার অনুচরেরা অসংযত বা উচ্ছৃংখল হইত না অথবা নেতার উপর আক্রোশ-বশতঃ প্রকাশ্যে গালাগালি করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিত না। দেশবন্ধুর সঙ্ঘের প্রধান নিয়ম ছিল সংযম ও শৃংখলা। পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিতে পারে কিন্তু ভোটের দ্বারা একবার কর্তব্য স্থির হইয়া গেলে সেই পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। সঙ্ঘের নিয়মানুবর্তী হওয়ার শিক্ষা এই পবিত্র ভারতভূমিতে নূতন নয়। ২৫০০ বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধ সর্বপ্রথমে ভারতবাসীকে এই শিক্ষা দিয়া থাকেন—

(ব্রহ্ম ভাষায়)
বৌঢান্দরণ গিম্‌সামি (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি)
ঢম্মান্দরণ গিম্‌সামি (ধম্মং শরণং গচ্ছামি)
তঙ্গান্দরণ গিম্‌সামি (সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি)

বস্তুতঃ, কি ধর্মপ্রচার, কি স্বদেশ-সেবা—সঙ্ঘ ও সঙ্ঘানুবর্তিতা ভিন্ন কোনও মহান্ কাজ এ জগতে সম্ভব নয়।

আর একটি অভিযোগ আমি শুনিয়াছি—রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া দেশবন্ধুকে নাকি শিক্ষাদীক্ষা হিসাবে নিম্নস্তরের লোকদিগের সাহচর্য করিতে হইত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত যে সকল কর্মীর সংস্পর্শে দেশবন্ধু আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি নিম্নস্তরের লোক বলিয়া মনে করিতেন কি না আমি জানি না। কথাবার্তায় তিনি সেরূপ ভাব কখনও প্রকাশ করেন নাই। হইতে পারে যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না বলিয়া এবং তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ তিনি অন্তরের ভাব গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁহার কারামুক্তির পর কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য সভা করেন। অভিনন্দনপত্রে দেশ-বন্ধুর গুণগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহারও বর্ণনা ছিল। তরুণের ভক্তি ও ভালবাসার অর্ঘ্য যখন তাঁহার নিকট নিবেদিত হইল তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ছিলেন চির-নবীন চির-তরুণ; তাই তরুণের বাণী তাঁহার মরমে গিয়া আঘাত করিত। তিনি যখন সভায় অভিনন্দন-পত্রের উত্তর দিবার জন্য উঠিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে! নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বেশীদূর বলিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। নির্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, দুই গণ্ড বহিয়া পবিত্র অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল। তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।

যাহাদের জন্য তাঁহার এত সমবেদনা, যাহাদের প্রতি তাঁহার এত ভালবাসা তাহাদিগকে তিনি কি করিয়া নিম্নস্তরের লোক বলিয়া মনে করিতে পারেন তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

অবশ্য যাঁহারা দেশবন্ধুর কাজ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি অথবা আভিজাত্যের গর্ব নাই। আশা করি বিনয়রূপ পরম সম্পদ তাঁহারা কোনও দিন হারাইবেন না।

দেশবন্ধুর শেষ পত্র আমি পাই পাটনা হইতে, সে পত্র আজ সুদূর ব্রহ্মদেশে আমার নিকট তাঁহার অমূল্য শেষ স্মৃতি-চিহ্ন। তাঁহার সহকর্মী ও অনুচরদের গ্রেপ্তারের পর তিনি যেরূপ যন্ত্রণায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন সেই পত্রে ছিল। সে

যন্ত্রণা যে কত তীব্র তা শুধু তিনিই বুঝিতে পারেন যিনি তাঁহার প্রাণের পরিচয় পাইয়াছেন।

১৯২১ ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধুর সহিত আটমাস কাল কারাগারে কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুই মাস কাল আমরা পাশাপাশি "সেলে" (ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে) প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলাম এবং বাকী ছয় মাস কাল আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের একটি বড় ঘরে ছিলাম। এই সময়ে তাঁহার সেবার ভার কতকটা আমার উপর ছিল। আলিপুর জেলে শেষ কয়েক মাস তাঁহার একবেলার রান্নাও আমাদিগকে করিতে হইত। গভর্নমেন্টের কৃপায় আমি যে আট মাস কাল তাঁহার সেবা করিবার অধিকার ও সুযোগ পাইয়াছিলাম—ইহা আমার পক্ষে চরম গৌরবের বিষয়। ১৯২১ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে আমি মাত্র ৩।৪ মাস কাল তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছিলাম। সুতরাং সেই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ভাল রকম বুঝিবার সুবিধা আমার হয় নাই। তারপর যখন আট মাস কাল একত্রে বাস করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটিল তখন খাঁটি মানুষকে আমি চিনিতে পারিলাম। ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'familiarity breeds contempt'—বেশী ঘনিষ্ঠতা হইলে নাকি অশ্রদ্ধা জন্মায়, কিন্তু দেশবন্ধু সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা শত-গুণে বাড়িয়াছে। এ-কথা বোধ হয় অন্যান্য সকলেই সমর্থন করিবেন।

দেশবন্ধু যে সহজ ও অনাবিল রসিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন এ-কথা আমি জেলখানায় ভাল রকম বুঝিতে পারি। কত রকমের রসিকতার দ্বারা তিনি দিনের পর দিন সকলকে আমোদিত করিয়া রাখিতেন! প্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের পাহারার জন্য সঙ্গীন-ধারী গুর্খা সৈনিক নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিন সকালে উঠিয়া তিনি দেখিলেন গুর্খা সৈনিকের পরিবর্তে একজন রুলধারী হিন্দুস্থানী সিপাহী উপস্থিত। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি হে সুভাষচন্দ্র, শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশী; আমরা কি এতই নিরীহ!" তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া অথবা ভাবিয়া চিন্তিয়া রসিকতা করিতে হইত না। পর্বত-নির্ঝরিণীর ন্যায় তাঁহার রসিকতা আপনার প্রেরণায় আপনি ছুটিত। আমি তাঁহার এই গুণের বিশেষ উল্লেখ করিলাম তার কারণ এই যে, জাতি হিসাবে আধুনিক বাঙ্গালীর মধ্যে রসের বোধ কিছু কম! আমি অন্যান্য বিদেশীয় জাতিদের সহিত তুলনা করিয়া এ-কথা বলিতেছি; হইতে পারে ভারতের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা এখনও বাঙ্গালীর রসবোধ বেশী।

রসবোধ থাকিলে মানুষ প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে সহজে কাতর হয় না, সর্বা-বস্থায়ই মজা লুটিতে পারে। জেলখানার একঘেয়ে জীবনের আবর্তে পড়িলে এ-কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে বুঝা যায়। দেশবন্ধুর রসিকতা এত সহজ ও অনাবিল ছিল যে, বয়সের তারতম্য অথবা আমাদের সম্বন্ধের দরুন আমরা কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতাম না।

ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং ইংরাজ কবিদের মধ্যে তিনি ব্রাউনিং-এর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ব্রাউনিং-এর অনেক কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তথাপি কারাগৃহে ব্রাউনিং-এর কবিতাগুলি তিনি বারংবার পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। দৈনন্দিন কথাবার্তা ও রসিকতার মধ্যে তিনি সাহিত্য হইতে এত কথা উদ্ধার করিতেন যে, নিজে ভাষ্য করিয়া না দিলে আমার পক্ষে সময়ে সময়ে রসবোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তিনি মানুষের নাম ভাল মনে রাখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে যে তাঁর অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সাহিত্যের অবতারণা করিয়া তিনি যেরূপ সাহিত্যকে সজীব করিয়া সর্বসাধারণের উপ-ভোগের বস্তু করিতে পারিতেন, এরূপ আর কয়জন সাহিত্যিক করিতে পারিতেন বা পারেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।

তাঁহার কোনও আত্মীয়ের জন্য দেশবন্ধু একসময়ে শতকরা ৯, সুদ হিসাবে দশ হাজার টাকা ধার করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা শোধ দিতে পারেন নাই বলিয়া উত্তমর্ণের এটর্নি খত পরিবর্তন করিবার জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। দেশবন্ধু তখন আলিপুর জেলে এবং আমরা তাঁহার নিকটেই। তাঁহার পুত্র চিররঞ্জনও সেখানে ছিলেন; তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, এই ঋণের কথা পরিবারবর্গের মধ্যে আর কেহ ইতিপূর্বে জানিতেন না। যে আত্মীয়ের জন্য টাকা ধার করা হইয়াছিল, খত পরিবর্তনের সময়ে তিনি লক্ষপতি। কিন্তু দেশবন্ধু দ্বিরুক্তি না করিয়া নূতন খতে দস্তখত করিয়া দিলেন। স্ত্রী, পুত্র কিংবা অন্য কোন আত্মীয়কে না জানাইয়া এইরূপ ঋণ করিয়া তিনি অপরের সাহায্য করিয়া দিতেন।

দেশবন্ধুর নিন্দা ও কুৎসা না করিয়া যাঁহারা জলগ্রহণ করেন না এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে আমি দেখিয়াছি বিপদের সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে। এই জাতীয় কোন ভদ্র-

লোক এক সময়ে দুই শত টাকার দাবি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন—আমার তহবিলে মাত্র ছয় শত টাকা আছে, আমি কি করিয়া দুই শত টাকা দিই। ভদ্রলোকটি জিদ করিলেন—তিনিও বিলম্ব না করিয়া দুই শত টাকা তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। এই ব্যাপারটা দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর ঘটিয়াছিল।

যে আট মাস কাল তাঁহার সঙ্গে ছিলাম সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের সকল কথা ও অনুভূতি জানিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি কোনও দিন কোনও কাজে অথবা কোনও কথার মধ্যে নীচতার চিহ্ন পর্যন্ত পাই নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার শত্রু অনেক ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের কথা জানিতেনও। কিন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না—এমন কি প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহাদের সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

কারাগারে দেশবন্ধু অধিকাংশ সময়ে অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন। ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক অনেক নূতন পুস্তক আনাইয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু সময়ের সংকীর্ণতার দরুন তিনি জেলখানায় থাকিতে পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্বার কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল বলিয়া তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার আরব্ধ কাজ শেষ করিতে পারেন নাই। সে সময়ে রাজনীতি ও জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই মতের অনুকরণ বা অনুসরণ পছন্দ করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের জাতীয়তা শিক্ষা ও জাতির প্রয়োজন হইতে আমাদের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ হইবে। এই জন্য তিনি বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ পছন্দ করিতেন না এবং তিনি এ বিষয়ে কার্ল মার্কসের বিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার আশা ছিল যে, ভারতের সকল ধর্ম-সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে চুক্তিপত্রের (pact) সাহায্যে সকল বিবাদ দূর হইবে এবং জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে। অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন যে, চুক্তিপত্রের সাহায্যে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হইতে পারে না, কারণ উহা সমবেদনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে, দর কষাকষির উপর নির্ভর করে না। দেশবন্ধু ইহার উত্তরে বলিতেন যে, আপসে মিটমাট না করিয়া লইতে পারিলে মানুষ একদিনও এ সংসারে বাঁচিতে পারে না এবং মনুষ্য-সমাজও একদিনও টিকিতে পারে না। কি পরিবারে, কি বন্ধুমহলে, কি সমাজ-জীবনে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে আপসে মিটমাট সাধিত না হইলে মানুষের পক্ষে একত্র বাস করাই অসম্ভব। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য চলে শুধু চুক্তিপত্রের উপর, তাহার মধ্যে ভালবাসার নাম গন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মত ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না—অথচ সেই দেশবন্ধুই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে এত ভালবাসিতেন যে, তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। এই জন্য তিনি ইসলামকে ভালবাসিতে পারিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কয়জন হিন্দু-নায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা মুসলমানকে আদৌ ঘৃণা করেন না? কয়জন মুসলমান জননায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা হিন্দুকে ঘৃণা করেন না? দেশবন্ধু ধর্মমত হিসাবে বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল। চুক্তিপত্রের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে, শুধু তাঁহারই দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা জাগরিত হইবে। তাই তিনি শিক্ষার (culture) দিক দিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন। হিন্দু শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষার (culture) মধ্যে কোথাও মিল পাওয়া যায় কি না এ বিষয়ে কারাগারে মৌলানা আক্রাম খাঁর সহিত তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত। আমার যতদূর স্মরণ আছে হিন্দু-মুসলমানের "শিক্ষার মিলনের" বিষয়ে মৌলানা সাহেব পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখিতে রাজী হইয়াছিলেন।

ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য, এ-কথা যেরূপ দেশবন্ধু জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। "স্বরাজ জন-

সাধারণের জন্য" এ-কথা পৃথিবীতে নূতন নয়। ইউরোপে বহুকাল পূর্বেও এই মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এ-কথা নূতন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারতে' প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু স্বামীজির সে ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রতিধ্বনি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুনা যায় নাই।

তাঁহার কারামুক্তির পর হইতে দেহত্যাগ পর্যন্ত দেশবন্ধু যে সব কথা প্রচার করিয়াছিলেন সে সব বিষয়ে তিনি তাঁহার কারাবাসের সময়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে সে সকল বিষয়ে আমাদের সহিত আলোচনা হইত। কাউন্সিল প্রবেশের কথা তিনি সেখানেই স্থির করিয়াছিলেন এবং বহুতর্কের পর আমরা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করি। কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব লইয়া তখন জেলখানার মধ্যে খুব দলাদলিও হইয়াছিল। দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের সংকল্পও আমরা সকলে জেলখানায় করি। তবে দুঃখের বিষয়, তাঁহার কতকগুলি মহৎ সংকল্প আজও কাজে পরিণত হয় নাই।

জেলখানার আর একটি ঘটনার উল্লেখ আমি এস্থলে না করিয়া পারি না—কয়েদীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা। আমরা যে সময়ে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হই, সে সময়ে আলিপুর জেলে আমাদের ওয়ার্ডে (ward) মথুর নামে একজন কয়েদী কাজ করিত। জেলের ভাষায় যাহাকে বলে "পুরানা চোর", মথুর তাহাই ছিল। তাহাকে বোধ হয় চোর বলিলে অন্যায় হয়, সে ছিল ডাকাত। আট দশ বার সে জেলখানায় ঘুরিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ডাকাতদের ন্যায়ই তাহার অন্তঃকরণ ছিল খুব সরল। কিছুদিন কাজকর্ম করিবার পর দেশবন্ধুর উপর মথুরের ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিল—সে তাঁহাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মথুরের প্রতিও দেশবন্ধুর সমবেদনা ও ভালবাসা জাগরিত হইল। ক্রমশঃ সে আমাদের সকলের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। রাত্রে অথবা দিনের বেলায় তাঁহার পা টিপিবার সময়ে মথুর তাহার জীবনের সকল ইতিহাস তাঁহাকে বলিত। মুক্তির সময় নিকটবর্তী হইলে দেশবন্ধু তাহাকে বলিলেন যে, তাহার খালাসের পর তিনি তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিবেন, যেন সে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া পুনরায় ডাকাতিতে মন না দেয়। মথুরও এই প্রস্তাবে যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং সে সংকল্প করিল যে, অতঃপর সে অসৎ কাজ ও অসৎ সঙ্গ ছাড়িয়া দিবে।

মথুরের খালাসের দিন দেশবন্ধু লোক পাঠাইয়া তাহাকে জেলখানা হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসেন। তারপর প্রায় তিন বৎসর কাল মথুর তাঁহার নিকট ছিল। তাঁহার পরিচারক হইয়া সে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়াছে। দাগী চোর বলিয়া থানার পুলিশ কিছু কাল তার পশ্চাতে ঘুরিয়াছিল।—তারপর যখন দেখিল সে বাস্তবিকই দেশবন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিল। জমাদার তাহাকে দেখিলে প্রায়ই বলিত, "তুই বেটা মানুষ হয়ে গেলি!" আমার খুব ভরসা ছিল মথুরের আর পতন হইবে না, কিন্তু দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর পত্রদ্বারা যখন মথুরের খবর পাইলাম তখন শুনিলাম সে ইতিপূর্বে তাঁহার দার্জিলিং বাসের সময় রসা রোডের বাড়ী হইতে অনেকগুলি রূপার জিনিসপত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এ অদ্ভুত কথা শুনিয়া আমার Les Miserable-এর কথা মনে পড়িল। আমার এখনও বিশ্বাস যে, মথুর তাঁর সঙ্গে থাকিলে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের দরুন লোভের বশীভূত হইত না। ক্ষণিক দুর্বলতার বশে সে চুরি করিয়াছিল সন্দেহ নাই, তবে আমার বিশ্বাস যে তিনি জীবিত থাকিলে সে কোন দিন কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িত। এখন তাহার কি অবস্থা হইবে তাহা ভগবানই জানেন।

মানুষ একাধারে কি করিয়া বড় ব্যারিস্টার, উদার প্রেমিক, পরম-বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিগ্বিজয়ী বীর হইতে পারে—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ সকলের মনে উদয় হয়। আমি নৃ-তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি—কৃতকার্য হইয়াছি কি না জানি না। আর্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিনটি জাতির রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতকগুলি গুণ বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে, সুতরাং রক্তের সংমিশ্রণ হইলে গুণের সংমিশ্রণও হইয়া থাকে। রক্ত-সংমিশ্রণের ফলেই বাঙ্গালীর প্রতিভা এমন সর্বতোমুখী এবং বাঙ্গালীর জীবন এত বৈচিত্র্যপূর্ণ, আর্যের ধর্মপ্রবণতা ও আদর্শবাদ, দ্রাবিড়ের কলাবিদ্যা ও ভক্তিমত্তা এবং মঙ্গোলের বুদ্ধিকৌশল, অনুচিকীর্ষা ও বাস্তববাদ বাঙ্গলার সাগরসঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে। বাঙ্গালী যে একসঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও ভাবুক, মায়াবাদবিদ্বেষী ও আদর্শবাদী, অনুকরণপ্রিয় ও সৃষ্টিক্ষম তাহা এই রক্তসংমিশ্রণের ফল। যে জাতির রক্ত কাহারও ধমনীতে প্রবাহিত হয় সে জাতির গুণ ও শিক্ষা (culture) জন্মের সময়ে সংস্কাররূপে তাহার চিত্তের মধ্যে

স্থান পায়। বাঙ্গালী যেরূপ এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে বাঙ্গলার শিক্ষাও (culture) তদ্রূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গলার ইতিহাস ও সাহিত্যের সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তিনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গলার সভ্যতা আর্য-সভ্যতা হইলেও তাহা একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। স্বামী দয়ানন্দ উত্তরভারত জয় করিয়া আর্যসমাজ আন্দোলন চালাইতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বাঙ্গলা দেশে আমল পাইলেন না কেন? আর কালীর ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সহস্র সহস্র শিক্ষিত বাঙ্গালী কেন এত ভক্তি করে বা অনুকরণ করে? বাঙ্গলায় দায়ভাগের প্রচলন কেন? বৌদ্ধধর্ম সর্বত্র বিতাড়িত হইলে অবশেষে বাঙ্গলা দেশে কেন শেষ আশ্রয় পাইল? বাঙ্গলা দেশে কেন নব্যন্যায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল? বাঙ্গলা শঙ্করের মায়াবাদ গ্রহণ করে নাই কেন? বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গলা দেশ হইতে বিতাড়িত হইলে শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের কেন সৃষ্টি হইল? এই সব প্রশ্ন তুলিলেই বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর শিক্ষাদীক্ষার একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গলার শিক্ষার মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—(১) তন্ত্র, (২) বৈষ্ণব ধর্ম, (৩) নব্যন্যায় ও রঘুনন্দনের স্মৃতি। ন্যায় ও স্মৃতির দিক দিয়া আর্যাবর্তের সহিত বাঙ্গলার নাড়ীর সংযোগ আছে। বৈষ্ণবধর্মের দিক দিয়া দাক্ষিণাত্যের সহিত বাঙ্গলার প্রাণের সংযোগ আছে। তন্ত্রের দিক দিয়া তিব্বতীয়, ব্রহ্মদেশীয় ও হিমালয় প্রান্তবাসী জাতিদের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ আছে।

ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন বাঙ্গালীকে তার্কিক ও নৈয়ায়িক-প্রকৃতি করিয়াছে। এই প্রকৃতি দেশবন্ধুর চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে বড় ব্যারিস্টার করিয়া তুলিয়াছিল। কি নৈয়ায়িক, কি ব্যবহারজীবী উভয়েরই চুল-চেরা তর্ক লইয়া কারবার। দেশবন্ধু প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না আমি জানি না—তবে পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। খুব বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ন্যায় তিনি চুল-চেরা তর্ক করিতে পারিতেন এবং অবিরাম বাক্যস্রোতের দ্বারা শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। দুই তিন শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে বড় নৈয়ায়িক হইতেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার বৈষ্ণব-ধর্ম ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা হইতে টানিয়া লইয়া নীরস বেদান্তের ভিতর দিয়া প্রেমমার্গে লইয়া গিয়াছিল, দার্শনিক মত হিসাবে তিনি অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদকে সবচেয়ে খাঁটি মত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অনেক বিষয়ে সন্ন্যাসীর মত হইলেও সন্ন্যাস তাঁহার ধর্ম ছিল না। ভগবান যেরূপ সত্য তাঁহার লীলাও তদ্রূপ সত্য; ব্রহ্ম সত্য বলিয়া জগৎ মিথ্যা নয়। অতএব ভগবানকে পাইতে হইলে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এ সব বর্জন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ভগবানের লীলা অনন্ত; সে লীলার রঙ্গমঞ্চ শুধু বহির্জগতে নয়, মানুষের অন্তরেও। মনুষ্য-হৃদয় নিত্যবৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনে জীবের সহিত ভগবানের, রাধার সহিত কৃষ্ণের অনন্ত লীলা চলিয়াছে। তিনি রসময়; তাই সকল রসের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। এরূপ মত যিনি পোষণ করেন তিনি যে নেতিমার্গ হইতে পারেন না—এ কথা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ দেশবন্ধু বিশ্ব-সংসারকে, তথা মনুষ্য জীবনকে, পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সাহায্যে যে জীবনের সকল প্রকার বিরোধ দূর হইয়া যায় এবং সর্বত্র সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়—এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাই বৈষ্ণব-ধর্ম হইয়াছিল তাঁহার জীবনের শেষ আশ্রয়। তিনি কথাবার্তায় এবং বক্তৃতায় প্রায়ই বলিতেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম—এ সব আলাদা করিয়া দেখিলে চলিবে না, পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে এবং একটিকেও বাদ দিলে জীবন পূর্ণ হইবে না।

যে দার্শনিকতত্ত্ব তাঁহার ধর্মরাজ্যের সকল বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছিল তাহার বাস্তব-রূপ প্রেমের মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে সকলের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রী সংস্থাপন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনে সামঞ্জস্য (synthesis) লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ম-ক্ষেত্রে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের মধ্যে কোনও প্রকার গোঁজামিল ছিল না বলিয়া তিনি অপরের মধ্যে বিরোধ বা গোঁজামিল সহ্য করিতে পারিতেন না।

জেলখানার আলোচনার মধ্যে তাঁহার নির্বিচার বদান্যতার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে তিনি বলিতেন, "দেখ, তোমরা মনে করিবে আমি নিতান্ত বোকা; লোকে আমাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু আমি সব বুঝিতে পারি, আমার কাজ দিয়ে যাওয়া, তাই

আমি দিয়ে যাই। বিচার করবার ভার যাঁর উপর তিনি বিচার করবেন।”

যে তন্ত্রের উপদেশে বাঙ্গালী শক্তিপূজা শিখিয়াছে সেই তন্ত্রের প্রভাবে দেশবন্ধু অসাধারণ তেজস্বী বীর হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু অবশ্য কোনও দিন তান্ত্রিক সাধনা করেন নাই, অন্ততঃ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু কুলাচার, বীরাচার, চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি সাধনা না করিলে যে শক্তিমান হওয়া যায় না—এ-কথা আমি স্বীকার করি না। তন্ত্রের সার কথা শক্তিপূজা। জগতের মূল সত্য আদ্যাশক্তি, যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সেই আদ্যাশক্তিকে সাধক মাতৃরূপে আরাধনা ও পূজা করিয়া থাকে; বাঙ্গালীর উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব খুব বেশী বলিয়া বাঙ্গালী জাতিহিসাবে মায়ের অনুরক্ত এবং ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিতে ভালবাসে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও ধর্মাবলম্বীরা (যথা ইহুদি, আরব, খৃষ্টান) ভগবানকে পিতৃরূপে আরাধনা করিয়া থাকে। ভগিনী নিবেদিতার মতে যে সমাজে নারী অপেক্ষা পুরুষের প্রাধান্য, সেখানে ভগবানকে লোকে পিতৃরূপে কল্পনা করিতে শিখে। অপর দিকে যে সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্য, সেখানে লোকে ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে শিখে। সে যাহা হউক, বাঙ্গালী যে ভগবানকে—শুধু ভগবানকে কেন, বাঙ্গলা দেশকে এবং ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে ভালবাসে—এ কথা সর্বজনবিদিত। দেশকে আমরা মাতৃভূমি কল্পনা করিয়া থাকি, মাতৃভূমির ইংরেজী তর্জমা—father land, আমরা অবশ্য mother land কথাটি চালাইয়া থাকি কিন্তু ইংরেজী ভাষার দিক হইতে তাহা শুদ্ধ নয়।

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে মাতৃভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

“সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।”

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গাহিয়াছিলেন—

“যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ”

এবং রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিয়াছিলেন—

“ও আমার জন্মভূমি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।”

তখন তাঁহারা তন্ত্রোপদিষ্ট মাতৃরূপের প্রভাবই দেখাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু মাতৃরূপের অনুরাগী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তাঁহার মাতৃভক্তির কথা অনেকেই জানেন। আলিপুর জেলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আমাদিগকে প্রায়ই পড়িয়া শুনাইতেন। বঙ্কিম-লিখিত মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত তাঁহার মাতৃভক্তি কত গভীর। তাঁহার “নারায়ণ” পত্রিকায় বৈষ্ণব-ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইত, শাক্ত ধর্মেরও সেইরূপ অনুশীলন হইত। দুর্গাপূজা সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ “নারায়ণে” প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

দেশবন্ধুর ব্যবহারিক জীবনেও আমরা তন্ত্রের প্রভাব দেখিতে পাই। পারিবারিক জীবনে দেশবন্ধুর মাতৃভক্তির কথা অনেকে জানেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষায় ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় যে বিশ্বাস করিতেন, একথাও সর্বজনবিদিত। শঙ্করপন্থীদের উপদেশ “নারী নরকস্য দ্বারম্”—এ কথা তিনি আদৌ স্বীকার করিতেন না। বস্তুতঃ চিন্তাজগতে ও কর্মজীবনে তন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার সভ্যতা ও শিক্ষার সার সঙ্কলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উদ্ভব হয় দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন।

তাঁহার গুণ বাঙ্গালীর গুণ, তাঁহার দোষ বাঙ্গালীর দোষ। তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় গৌরব ছিল যে, তিনি বাঙ্গালী। তাই বাঙ্গালী জাতিও তাঁহাকে এত ভালবাসিত। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, বাঙ্গালীর দোষগুণ লইয়াই বাঙ্গালী—বাঙ্গালী। কেহ বাঙ্গালীকে ভাবপ্রবণ বলিয়া ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করিলে তিনি ব্যথিত হইতেন—তিনি বলিতেন—আমরা ভাবপ্রবণ ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। তার জন্য লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।

বাঙ্গলার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গলার প্রকৃতিরূপে, বাঙ্গলার সাহিত্যে, বাঙ্গলার গীতি-কবিতায়, বাঙ্গালীর চরিত্রে যে সে বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—এ কথা দেশবন্ধু যেরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে সেরূপ আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। অবশ্য এ ভাব তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। বঙ্কিম,

ভূদেব প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ এই ভাবের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সাহিত্য ও শিক্ষার দিক দিয়া যে বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন দেশবন্ধু তাহা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য, দেশবন্ধু যেরূপ গভীরভাবে এই চিন্তার ধারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, "নারায়ণ" পত্রিকার ভিতর দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে তিনি এই ভাবের প্রচারের জন্য এবং তদ্বিষয়ে মৌলিক গবেষণার সহায়তার নিমিত্ত এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিতে পারি যে, বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি তাঁহার মুখের বাণী ও লেখা হইতে শিখিয়াছি।

মনুষ্য জাতির শিক্ষা (culture) এক, না বহু—এ প্রশ্ন অনেকে তুলিয়াছেন। কেহ বলেন যে, শিক্ষার মধ্যে ভেদ নাই—শিক্ষা একই—তাঁহারা অদ্বৈতবাদী। অপরে বলেন যে, শিক্ষার মধ্যেও জাতি আছে, অতএব শিক্ষা বহু—তাঁহারা দ্বৈতবাদী। দেশবন্ধু কিন্তু ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। শিক্ষা বহু বটে, একও বটে। মূলতঃ যদিও মনুষ্য জাতির শিক্ষা এক—তথাপি সেই একের বিকাশ বহুর মধ্য দিয়া, বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া। উদ্যানে যেরূপ নানাপ্রকার বৃক্ষ থাকে এবং সেই সকল বৃক্ষে বিভিন্ন রকমের ফুল ফুটিয়া থাকে, মানবসমাজের মধ্যেও তদ্রূপ নানাপ্রকার শিক্ষা (culture) বিকাশলাভ করে। এই সকল পুষ্প ও বৃক্ষ লইয়া যেরূপ একটা উদ্যানের সত্তা, বিভিন্ন শিক্ষার সমাবেশে সেরূপ মনুষ্য জাতির শিক্ষা। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ শিক্ষার বিকাশ সাধন করিলে তার ফলে বিশ্বমানবের শিক্ষা পরিপুষ্ট হয়। জাতীয় শিক্ষাকে বর্জন করিয়া অথবা অবহেলা করিয়া বিশ্বমানবের সেবা সম্ভবপর হয় না। দেশবন্ধুর স্বদেশপ্রেমের পরিণতি বিশ্বপ্রেমে; কিন্তু তিনি স্বদেশপ্রেমকে বাদ দিয়া বিশ্বপ্রেমিক হইবার প্রয়াস পান নাই। অপর দিকে তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে আত্যন্তিক স্বার্থপরতার দিকে লইয়া যাইতে পারে নাই।

দেশবন্ধু তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে বাঙ্গালীকে ভুলিয়া যাইতেন না। অথবা বাঙ্গলাকে ভালবাসিতে গিয়া স্বদেশকে ভুলিতেন না। তিনি বাঙ্গলাকে ভালবাসিতেন প্রাণ দিয়া, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা বাঙ্গলার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গলার বাহিরে তাঁহার যে সকল সহকর্মী ছিলেন তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, দেশবন্ধুর সংস্পর্শে আসিবার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র-দেশে তিনি তিলক মহারাজের ন্যায় ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণও তাঁহার নিকট তদনুরূপ ভালবাসা ও সহানুভূতি পাইতেন।

দেশবন্ধু বলিতেন, বাঙ্গলাকে স্বরাজ আন্দোলনে অগ্রণী হইতে হইবে। ১৯২০ খৃঃ বাঙ্গলা স্বরাজ আন্দোলনের নেতৃত্ব হারাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গলা আবার ১৯২৩ খৃঃ নেতৃত্ব ফিরিয়া পায়। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে, কবে ফিরিয়া পাইবে ভগবানই জানেন।

আর একটি কথা দেশবন্ধু প্রায়ই বলিতেন—ভারতবর্ষের কোনও আন্দোলন বাঙ্গলা দেশে চালাইতে হইলে তার উপর বাঙ্গলার ছাপ দিয়া লইতে হইবে। তিনি বলিতেন যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলন বাঙ্গলায় চালাইতে হইলে আগে বাঙ্গলার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বাস্তব জীবনের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁহারা এই মত সমর্থন না করিয়া পারিবেন না।

জনসাধারণের উপর, এমন কি তথাকথিত বড়লোকদের উপরও দেশবন্ধুর আশ্চর্য প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ তাঁহার প্রভাবের কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যখন যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন তখন তাহা সাধন করিয়াছেন। "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্ শরীরং বা পাতয়েয়ম্"।—এই বাণী তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে গাঁথা ছিল। দুর্বার বিক্রমে যখন যে পথে চলিতেন কেহ তাঁহাকে রোধ করিতে পারিত না। সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলরাশির ন্যায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার বেগে আপন আদর্শের পানে ছুটিতেন। প্রিয়জনের আর্তনাদ অথবা অনুচরবর্গের সাবধানবাণীও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিত না। এই দিব্যশক্তি দেশবন্ধু কোথা হইতে পাইলেন? সে শক্তি কি সাধনার দ্বারা লভ্য?

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, দেশবন্ধু শক্তির সাধক হইলেও তিনি তন্ত্রমতে শক্তির সাধনা করেন নাই। তাঁহার প্রাণ ছিল বড়; আকাঙ্ক্ষা ছিল বড়। "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"—এই কথা যেন তাঁহার অন্তরের বাণী ছিল। তিনি যখন যাহা চাহিতেন—সমস্ত প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়া চাহিতেন। তাহা পাইবার জন্য একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। পর্বতপ্রমাণ অন্তরায়ও তাঁহাকে ভীত বা পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না। নেপোলিয়ান

বোনাপার্ট যেরূপ এক সময়ে তাঁহার সম্মুখে আল্পস্ (Alps) পাহাড় দেখিয়া বলিয়াছিলেন —"There shall be no Alps"—আমার সম্মুখে আল্পস্ পাহাড় দাঁড়াইতে পারিবে না—তিনিও সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। কি সম্বল লইয়া তিনি "ফরওয়ার্ড" পত্রিকা প্রকাশে ও কাউন্সিল-জয়ের চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ যিনি জানেন তিনিই এই উক্তি সমর্থন করিবেন। আমরা কোনও প্রকার অসুবিধা বা বাধার কথা তুলিলে তিনি ধমক দিয়া বলিতেন—তোমরা একেবারে নির্ভরসা (তোমরা pessimist)। আমারও কাজ ছিল যেখানে কোন বিপদ বা অসুবিধার আশঙ্কা—সেই কথাটি তুলিয়া ধরা, তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন—"you young old men"—ওহে অকাল-বৃদ্ধ যুবকবৃন্দ। যাঁহারা মনে করেন যে, দেশবন্ধু মদরত প্রকৃতির ছিলেন এবং যুবকদের পাল্লায় পড়িয়া তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চরমপন্থীর ন্যায় কাজ করিতেন—তাঁহারা তাঁহার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন চির-নবীন—চির-তরুণ—তিনি তরুণদের আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিতেন; তাহাদের সুখদুঃখের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিতেন। তিনি তরুণদের সঙ্গ ভালবাসিতেন—তাই তরুণরাও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়িতে চাহিত না। এই সব কারণে আমি পূর্বে দেশবন্ধুকে "তরুণের রাজা" বলিয়াছি।

তাঁহার ত্যাগ, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিকৌশল (tact) প্রভৃতি গুণের কথা দেশবাসী অবগত আছেন—সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবের আর একটি কারণ বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। সে কারণের উল্লেখ ইতিপূর্বে আমি কতকটা পাইয়াছি। তিনি সর্বদা অনুভব করিতেন যে, যখন যাহা তিনি করেন তাহা তাঁহার ধর্মজীবনের অঙ্গ-স্বরূপ। বৈষ্ণব-ধর্মের সাহায্যে তিনি বাস্তবজীবন ও আদর্শের মধ্যে একটা মধুর সামঞ্জস্য (synthesis) স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সামঞ্জস্যবোধ ক্রমশঃ ওতপোতভাবে তাঁহার প্রাণ-মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি এই অনুভূতির ফলে নিজেকে ভগবানের অনন্ত-লীলার যন্ত্রস্বরূপ মনে করিতেন। নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে মানুষের "অহং কর্তা" এই জ্ঞান লোপ পাইয়া আসে। অহংকার লোপ পাইলে মানুষ দিব্য শক্তির আধারে পরিণত হয়। তখন তাঁহার শক্তির নিকট সাধারণ মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। দেশ-বন্ধুর হইয়াছিল তাহাই; তাঁহার জীবনের শেষদিকে তাঁহার প্রবল শত্রু তাঁহার সম্মুখীন হইলে যেন ভগ্নপৃষ্ঠ হইয়া পড়িতেন। দেশবাসীর মনেও ক্রমশঃ এই ধারণা জন্মিতেছিল—যত্র দাশ মহাশয়, তত্র জয়।

তিনি কত রকম লোককে দিয়া কত দিকে কাজ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় দেশবাসী অবগত নহেন। তাঁহার অনুপ্রেরণার ফল যে দিন ফলিবে দেশবাসী সে দিন তাহা জানিবেন। আদর্শের নিত্য অনুপ্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত হইতেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাও উদ্দীপিত হইতেন। জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তাঁহার ছিল এক ধ্যান, এক চিন্তা—স্বদেশ-সেবা এবং সেই স্বদেশ-সেবা তাঁহার ধর্মজীবনের সোপান স্বরূপ।

দেশবন্ধুর জীবনের কথা উল্লেখ করিলে যদি আর একজনের কথা না বলা হয় তবে কিছুই বলা হইল না। যে দেবী লোকচক্ষুর অন্তরালে মূর্তিমতী সেবা ও শান্তির মত ছায়ার ন্যায় সর্বদা দেশবন্ধুর পার্শ্বে থাকিতেন, তাঁহাকে বাদ দিলে দেশবন্ধুর জীবনে কতটুকু বাকী থাকে কে বলিতে পারে? ভোগের অত্যুচ্চ শিখরে যিনি হিন্দু রমণীর আদর্শ লজ্জা, নম্রতা ও সেবা কোনও দিন বিস্মৃত হন নাই—বিপদের ঘনান্ধকারে যিনি হিন্দু পতিব্রতার একমাত্র সম্বল—চিত্তস্থৈর্য ও ভগবদ্বিশ্বাস হারান নাই—সেই দেবীর কথা লিখিতে গেলে আমি ভাষা খুঁজিয়া পাই না। দেশবন্ধু ছিলেন তরুণদের রাজা। তাঁহার পতিব্রতা সাধ্বী পত্নী ছিলেন—তরুণদের মাতা। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর তিনি আজ শুধু চিররঞ্জনের মাতা নন্, শুধু তরুণদের মাতা নন্—তিনি আজ নিখিল বঙ্গের মাতা। বাঙ্গালীর হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আজ তাঁহার চরণে সমর্পিত।

আলিপুর মামলায় অরবিন্দবাবুর সমর্থনকালে দেশবন্ধু ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন—

He will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. His words will be echoed and re-echoed etc.

এই কথাগুলি কি আজ দেশবন্ধু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়?*

---

* শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'দেশবন্ধু স্মৃতি' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত।

মান্দালয় জেল
উত্তর ব্রহ্মদেশ
২৪। ৯। ২৬

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্বাচনদ্বন্দ্বে আমি জাতীয় মহাসমিতি (কংগ্রেস কমিটি) কর্তৃক উত্তর-কলিকাতার অ-মুসলমান বিভাগের জন্য সভ্যপদপ্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়াছি। জনমতের আনুকূল্যের সংবাদ পাইয়া স্বদেশসেবী ও শুভার্থিগণের উপদেশে এবং দেশের ও দশের সেবার অধিকতর সুযোগ পাইবার ভরসায় আমি জাতীয় মহাসমিতির আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়াছি। আমি কারাবাসী না হইলে সদস্য-পদপ্রার্থী হইবার পূর্বেই যে ভাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনাদের মতামত লইতাম, আমার বর্তমান অবস্থায় আমি তাহা করিয়া উঠিতে পারিলাম না; কিন্তু আমি আশা করি, আপনারা নিজগুণে আমার ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

কারারুদ্ধ অবস্থায় নির্বাচনপ্রার্থী হওয়া উচিত কি না এবং নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে কি না—সে বিষয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। জাতীয় মহাসমিতিও এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া এবং নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে স্থির করিয়া আমাকে দাঁড়াইতে আদেশ করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আজ জীবিত থাকিলে তিনিও আমাকে নির্বাচনপ্রার্থী হইতে আদেশ করিতেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুনঃ নির্বাচনের সময়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার এই ধারণা সমর্থন করে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ও বর্তমান অবস্থায় আমার নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে ভাবিয়া আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। জনমতের আনুকূল্যও যে আমার এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য অনেকটা দায়ী তাহা বলা বাহুল্য। সুযোগ থাকিলে ও সম্ভবপর হইলে আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার সকল মতামত আপনাদের নিকট নিবেদন করিতাম এবং আপনাদের উপদেশ ও পরামর্শ শুনিতে চাহিতাম। কিন্তু সে অধিকার হইতে আমি গভর্নমেন্ট কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি।

প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল আমি বিনা-বিচারে ও বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাকে গভর্নমেন্টের কোনও আদালতের সামনে উপস্থিত করা হয় নাই। এমন কি আমার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কি অভিযোগ ও সাক্ষ্য আছে তাহাও প্রকাশ্যে অথবা জনান্তিকে আমাকে বলা হয় নাই। আমার অপরাধ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, অপরাধ যদি কিছু করিয়া থাকি তাহা এই যে, পরাধীন জাতির সনাতন গতানুগতিক জীবনপন্থা ছাড়িয়া কংগ্রেসের একজন দীন সেবক হিসাবে স্বদেশ-সেবায় মন-প্রাণ-শরীর সমর্পণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তারপর আমি যে শুধু কারারুদ্ধ হইয়াছি তাহা নয়, বিশ মাস হইল আমি দেশান্তরিত। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলের পবিত্র স্পর্শ হইতে কতকাল যাবৎ আমি বঞ্চিত!

তবে আমার সান্ত্বনা ও সৌভাগ্য এই যে, আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আজ "আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে, গোলাপ হয়ে" ফুটিয়াছে। এইখানে আসিবার পূর্বে আমি বাঙ্গলাকে, ভারতভূমিকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুন সোনার বাঙ্গলাকে, পুণ্য ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস— "স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" বাঙ্গলার মোহনীয় রূপ আজ আমার নিকট কত পবিত্র, কত সুন্দর হইয়াছে। যে আত্যন্তিক আত্মোৎসর্গের আদর্শ লইয়া আমি কর্মভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নির্বাসনের পরশমণি আমায় দিন দিন সে মহাদানের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। যে চিরন্তন সত্য বাঙ্গলার ভাগীরথী ও বাঙ্গলার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার যে প্রাণধর্মকে বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া

দেশবন্ধু পর্যন্ত প্রতিভাবান মনীষিগণ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যের মধ্যে প্রকট করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার যে বিচিত্র রূপ কত শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকের লেখনী ও তুলিকার বিষয় হইয়াছে, আজ তাহার আভাস পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। এই অনুভূতির পুণ্য প্রভাবে আমার দুই বৎসর কারাবাস সার্থক হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এহেন মায়ের জন্য দুঃখ ও বিপদ বরণ করা কত গৌরবের, কত সৌভাগ্যের কথা।

এইরূপ নিবেদনে নিজের পরিচয় দেওয়ার একটা রীতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আমার এমন কোনও সম্বল বা সম্পদ নাই যাহার উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদের সহায়তা দাবি করিতে পারি।

পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন উচ্ছল জলধি তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত ভারতবাসীর প্রাণ দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য উতলা হইয়াছিল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া আমি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারত-মাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করিব এবং এই আন্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া পূর্ণতর জীবন লাভ করিব—এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। স্বদেশসেবা বা রাজনীতির পর্যালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তিহিসাবে গ্রহণ করি নাই। এই জন্য পরাধীন দেশে স্বদেশসেবকের জীবনে যে বিপদ ও পরীক্ষা, দুঃখ ও বেদনা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য কায়মনে প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি কি না, অথবা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি—তার বিচার করিবেন আমার দেশবাসিগণ। আমার এই ক্ষুদ্র অথচ ঘটনাবহুল জীবনে যে সব ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিঘ্ন-বিপদের সেই কষ্টিপাথর দ্বারা আমি নিজেকে সূক্ষ্মভাবে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই নিবিড় পরিচয়ের ফলে আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, যৌবনের প্রভাতে যে কণ্টকময় পথে আমি জীবনের যাত্রা সুরু করিয়াছি, সেই পথের শেষ পর্যন্ত চলিতে পারিব; অজানা ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া যে ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা উদ্‌যাপন না করিয়া বিরত হইব না। আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আমি এই সত্য পাইয়াছি—পরাধীন জাতির সব ব্যর্থ—শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম—সকলই ব্যর্থ যদি তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে,—"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?"

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন—স্বরাজলাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিরত থাকিতে পারি।

আত্মোৎসর্গের পবিত্র ও জীবন্ত বিগ্রহ প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চরণে দেশসেবায় আমার প্রথম শিক্ষা দীক্ষা। তাঁহার জীবদ্দশায় সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার পতাকা অনুসরণ করিয়াছি। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও তাঁহার মহিমময় জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া একনিষ্ঠভাবে জীবনের পথে চলিব, এই সংকল্প মনের মধ্যে পোষণ করি। সর্বমঙ্গলময় ভগবান আমার সহায় হউন।

আমার এই উপস্থিত সমস্যার সমাধান আপনাদের হাতেই ছাড়িয়া দিলাম, কারণ এ নির্বাচনদ্বন্দ্বে প্রবাসী রাজবন্দী পাহাড়, নদী ও সমুদ্রের ব্যবধানে থাকিয়া কি করিতে পারে? দেশমাতৃকার অকিঞ্চন সেবক হইলেও আমি তো আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহি। আজ সকলের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও কি আপনাদের উপর আমার কোন দাবি নাই? আমি প্রার্থনা করি, আপনারা ভুলিবেন না যে, আমার জয়ের অর্থ জাতীয় মহাসভার জয়, জনমতের জয়, আপনাদের জয়। সম্মুখে যে ব্যয়সাপেক্ষ নির্বাচন সংগ্রাম তাহাতে আপনারাই আমার সহায় সম্পদ, বল ভরসা—সব কিছু। আপনাদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব ইহাই আমার অভিপ্রায়। আমার সন্দেহ নাই যে, আপনারা আমাকে সেবার সুযোগ ও অধিকার দিয়া ধন্য করিবেন। আর অধিক কি বলিব—দেশমাতৃকার মূর্ত বিগ্রহ আপনারা। সাগর-পারের বন্দীর সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি—*

---

*এই নিবেদন-পত্রটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আটক করেন। সুভাষচন্দ্রের মুক্তির পর এটি প্রকাশিত হয় এবং 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আমরা কি চাই?

আমরা চাই ভারতের গণতন্ত্র স্বাধীনতা

জনগত আইনভঙ্গ, খাজনাবন্ধ ও ভারতব্যাপী ধর্মঘটই স্বাধীনতা লাভের পরাধীন ভারতের অন্যতম ও নিরস্ত্র ভারতের একমাত্র অস্ত্র।

স্বাধীনতা মানুষের সবচেয়ে বড় সত্য। সুতরাং স্বাধীনতাকে এইভাবে কায়মনোবাক্যে জীবন ও মরণ দিয়ে স্বীকার করাই সত্যাগ্রহ। স্বাধীনতার জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বিদ্রোহের মতই সত্য।

মানুষের অন্তরের চিরদিনের সত্যাগ্রহ মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের সত্যাগ্রহ-সাধনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই নবযুগে মহাত্মা গান্ধীকেই এই মন্ত্রের দ্রষ্টা বলে সমস্ত জগত স্বীকার করেচে। কিন্তু মহাত্মা একটা ভুল করেছিলেন, সত্যাগ্রহের অধিকার তাঁরই নিজস্ব হয়ত—এ রকম ভেবেছিলেন, তাতে মানুষমাত্রেরই একান্ত দাবী রয়েচে তা তিনি ভুলে গেছলেন। এইজন্য তিনিই একা বার্দোলিতে সত্যাগ্রহ সুরু করতে চেয়েছিলেন এবং বন্দী ও কারারুদ্ধ হবার পর এই অভিযান চালাতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মানুষের এই দাবী একবার জাগলে আর দমবার নয়। তাই পাঞ্জাব বাংলা ও দাক্ষিণাত্যে জনগণ স্বেচ্ছায় এই সত্যাগ্রহ সুরু করেচে। মহাত্মা যাকে সমাজের মস্তকে ও মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত করে রাখতে চেয়েছিলেন তা আজ সমাজের হাতে পায়ে ছড়িয়ে পড়েচে ও কাজ করচে। তাতে করে সত্যেরই জয় হয়েচে।

আমরা বিশ্বাস করি, এই সত্যাগ্রহই ভারতকে স্বাধীন করবে। এই সত্যাগ্রহ প্রথমে ভারতকে স্বাধীন (independent) করবে, তারপরে ক্রমশঃ স্বরাজ (freedom) গড়ে তুলবে; এই সত্যাগ্রহই বিদেশীর আধিপত্য থেকে পরে আত্মরক্ষার অস্ত্র হতে পারবে। শুধু এই না, আমরা মনে করি ভারতের মুক্তির সঙ্গে এই অস্ত্র জগতকেও যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, মিথ্যা, পাপ ও স্বার্থের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবে। ভারতের স্বরাজের সঙ্গে জগতের স্বরাজ, ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাষ্ট্রীয় মুক্তির মতো সমাজের মুক্তিও আমরা চাই।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সমষ্টি-স্বাচ্ছন্দ্যই হচ্ছে সামাজিক স্বাধীনতার ভিত্তি। হিন্দু সমাজকে বলীয়ান ও মহীয়ান করে তুলতে হলে ব্রাহ্মণ-তন্ত্র সামাজিক শাসনের উচ্ছেদ করতেই হবে। ব্রাহ্মণ-তন্ত্র এতদিন কেবল মৃত্যুই দিয়েচে, এখন অমৃতের জন্য হিন্দু তন্ত্র চাই। সমাজেরও গণতন্ত্র দরকার। মনুর সত্ত্ব লোপ করে মনুষ্যত্ব স্বীকার করতে হবে।

আমাদের সমাজে নারীর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা চাই।

এক কথায় পুরুষ যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ভোগ করচে নারীকেও আমরা সেই স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী দেখতে চাই। পুরুষেরা কোনোদিন তা' নারীকে দেবে এবং দিলেও নারীরা তা সত্যি পাবে, এ বিশ্বাস আমাদের নেই। নারীকেই বিদ্রোহ করে স্বাধিকার অর্জন করতে হবে, তাছাড়া আর কোনো পথ নেই। যুগযুগান্ত ধরে নারী ধীরে ধীরে তার অধিকার (যা আগে কোনোদিন কোথাও ছিল কিনা জানা নেই) ফিরে পাবে এ ভরসা আমাদের নেই। অকস্মাতের দাবীই পৃথিবীতে সবার চেয়ে বড় দাবী। নারী একদিনেই তার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে ও করবে। সনাতন অচলায়তন একদিনের ভূমিকম্পেই ধ্বসে যেতে পারে; যুগান্তকালের পুঞ্জীভূত আবর্জনা একদিনের দাবানলেই সাফ হতে পারে—দিনে দিনে তিলে তিলে তার ক্ষয় হবার সম্ভাবনা নেই।

তারপরে কৃষকের সত্ত্ব ও স্বার্থ—

যার প্রথম কথাই হচ্ছে জমির পরগাছার মতো জমিদারি-পরগাছা তুলে ফেলা। আমরা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অচিরস্থায়ী করার পক্ষপাতী। ঐ সঙ্গে যে সব মহাজন চাষীদের ঋণ দিয়ে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করেচে ও হয়ত-আইন-সঙ্গত অন্যায়ে তাদের উচ্ছেদ করে তাদের জমি ভোগ দখল করচে, তাদের কাছ থেকেও চাষীরা আপনার জমি ফিরে পায় এও আমরা চাই। দু'একজনের অনাবশ্যক উদরস্ফীতি বাড়িয়ে তোলবার জন্য লাখ লাখ লোক শুকিয়ে মরতে পারে না।

কৃষকদের organise করবার এক মাত্র উপায় তাদের ফসল organise করা। রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতি নয়, কেবল অর্থনীতির ভিত্তির ওপরেই কৃষিসমাজের বিরাটবাহিনী সংঘবদ্ধ হতে পারে। এই সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা আজ আমরা না দিলে কালে তারা নিজেরাই আপনার মধ্যে তা' পাবে। এবং তখন এই কর্তব্যচ্যুতির ঋণ হয়ত আমাদের রক্ত দিয়ে শুধতে হবে।

হয়ত তাই ভারতের ভাগ্য। শতকরা নব্বইজনের দাবী যদি আমরা বুঝেও স্বীকার না করি, তাহলে আমরা চাই—তারা নিজেরা শক্ত হয়ে আমাদের তা' বুঝিয়ে দিক, আমাদের অন্ন, বস্ত্র ও শান্তি কেড়ে নিয়ে পথের মাঝে লাঞ্ছিত করে এতদিনকার বিনিময় শোধ দিক। তা' হলে তাদের ও আমাদের সত্যিকার পাওয়া হবে—এবং সত্য পেয়ে মানুষের অধিকারে সহজে আমরা উভয়েই উঁচু মাথায় দাঁড়াতে পারব।

শ্রমিকেরও তার সত্য পাওনা পাওয়া চাই।

কলকারখানার মজুরই কেবল শ্রমিক নয়, খবরের কাগজের সম্পাদক থেকে, সরকারী দপ্তরের কেরাণী থেকে, রাস্তার ঝাড়ুদার, কুলী পর্যন্ত সবাই শ্রমিক। চাষীদেরও অধিকাংশ জমিহীন ও কেবল-শ্রমিক। সত্ব নিয়ে মূলধনীর সঙ্গে এদের প্রতিদিনের বিরোধ। তার যা চাই এবং সে যা চায় দুইই তাকে পেতে হবে।

মূলধনী ও শ্রমিকের সমান স্বত্ব ও স্বার্থ হওয়া চাই। ভারতকেও আর্থিক মুক্তি-সাধন করতে হবে। একদিন ভারতের সব ব্যবসা (Nationalised) জাতির সম্পত্তি হবে এবং অর্থে সকলের সমান অধিকার হবে। তখনই সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির মধ্যে বিরোধ থাকবে না।

কৃষক সাগরের মত সর্বদা ক্ষুব্ধ হলেও আপনার বিরাট গভীরতার জন্যে প্রশান্ত, শ্রমিক কিন্তু কালবোশেখীর মতো দুর্জয়—এই দুয়ের মিলন ঘটলে কি-অঘটন সংঘটন হতে পারে তা' বোধহয় আজ আর চিন্তার তত্ত্ব নয়, ঐতিহাসিক তথ্য হয়ে দাঁড়িয়েচে।

কোনো মানুষেরই শারীরিক বেঁচে থাকবার জন্য চার ঘন্টা—কি বড়-জোর ছ'ঘন্টার বেশী খাটা উচিত নয়। কেননা তাকে কেবল দেহেই নয়, তার মনে, চিন্তায়, আদর্শে, সাধনায়, সাহিত্য-কলা-কাব্যে, সৌন্দর্যে প্রেমে ও তার সৃষ্টিতে তাকে বেঁচে থাকতে হবে—প্রত্যহই বেঁচে থাকতে হবে আজীবন। তাকে আত্মায় বাঁচতে হবে, এজন্য তাকে অমৃতেরও সন্ধান করতে হবে। কেননা সে অমৃতের পুত্র আর তার অন্তরের অনাদি অমৃতের আকাঙ্ক্ষা তাকে অনুক্ষণ বলচে, "যেনাহং নামৃত স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ !" আমরা সবার ওপরে সেই অমৃতের অধিকার চাই।*

---

* ১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র বসু 'আত্মশক্তি' পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। সেই সময় এই পত্রিকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এটি তার মধ্যে অন্যতম। —সম্পাদক।

প্রেসিডেন্সি কলেজে সমস্যা—একটি সত্য বিবরণী

সুভাষচন্দ্র বসু

সোমবার, হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের আট-দশজন প্রাক্তন ছাত্র, যারা বর্তমানে তৃতীয় বর্ষ বি, এ ক্লাসে, তাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়। সোয়া বারোটা নাগাদ, এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়, এবং ছাত্রেরা তখন ফিরে আসে। তাদের আগে থেকে বলা হয়েছিল যে অধ্যাপক আর. এন. ঘোষ, সেদিন বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত যে ইংরেজী ক্লাসটি হয় সেটি নেবেন না। ফিরবার পথে কলেজের এক কর্মচারীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। কর্মচারীটি জানায় যে অধ্যাপক ঘোষ কলেজে এসেছেন এবং সম্ভবত ক্লাসটিও নেবেন। মিঃ ওটেন, যে ঘরে ক্লাস নিচ্ছিলেন, ছাত্রেরা সেই ঘর-সংলগ্ন বারান্দা দিয়ে চলে আসছিল। মিঃ ওটেন ঘর থেকে বের হয়ে এসে তাদের পথরুদ্ধ করেন, এবং দু-একজনের হাত ধরে, অপমানজনক ভাবে তাদের চলে যেতে আদেশ দেন। ছাত্রেরা অতি ভদ্রভাবে, অধ্যক্ষের কাছে আবেদনের উদ্দেশ্যে নীচে নেমে এল। ইতিমধ্যে, ছাত্রেরা আগে থেকেই তৃতীয় বর্ষের শ্রেণীকক্ষে জমায়েত হয়েছিল। বারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়ে গেছে দেখে, তারা নীচে নেমে অধ্যাপককে তা জানাবে বলে মনে করল। নামবার পথে, ওটেন সাহেবের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হল। তিনি ভয় দেখালেন এই বলে যে একটা বাজার আগে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করলে পাঁচ টাকা জরিমানা হবে। যদিও ছাত্রেরা তাঁকে, তাদের নীচে যাবার উদ্দেশ্যের কথা জানাল, এবং কোনও রকম গোলমাল না হবার আশ্বাস দিল, তবুও তিনি ঠিক একই রকম অপমানজনক ভাবে তাদের ফিরিয়ে দিলেন। বারোটা-পঁচিশের সামান্য আগে, অধ্যাপক ঘোষ এলেন এবং ক্লাস ছুটী ঘোষণা করলেন। মিঃ ওটেনের শাসানি সত্ত্বেও, অধ্যাপক ঘোষের অনুমতি নিয়ে ছাত্রেরা নামতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি সদর্থক উত্তর দিয়েছিলেন। চলে আসার পথে মিঃ ওটেনের সঙ্গে আবার তাদের দেখা হয়। তারা জানায় যে তাদের ক্লাস ছুটী হয়ে গেছে এবং কোনও রকম গোলমাল তারা করবে না। এতৎসত্ত্বেও ওটেন মহাশয়, তাদের ফিরে গিয়ে একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আদেশ দেন। মৌখিক ভর্ৎসনার সঙ্গে আঘাত মিশিয়ে, তিনি এমনকি ছাত্রদের অভদ্রভাবে ধাক্কা দেন। ছাত্রেরা ফিরে আসে। একটার সময় ওটেন সাহেব তাদের কাছে যান এবং আরও বেশী কিছু সাবধানবাণী মনে করিয়ে আসেন। তিনি বলেন, ছাত্রদের জরিমানা করার অধিকার একজন অধ্যাপকের আছে। এই ক্ষমতার এতকাল সদ্ব্যবহার করা হয় নি বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে এখন থেকে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। ছাত্রেরা অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করে। সেইদিনই কিছু সংখ্যক বিক্ষুব্ধ ছাত্রের সঙ্গে অধ্যক্ষের দীর্ঘ এক আলোচনা হয়। তিনি ছাত্রদের আবেদন প্রত্যাহার করে মিঃ ওটেনের সঙ্গে মিটমাট করে নিতে বলেন। ব্যক্তিগত ভাবে, কেবলমাত্র তিনজন, তাদের ব্যক্তিগত অভিযোগের বিষয়ে মিঃ ওটেনের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়। সমবেতভাবে ক্লাসটি কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হয় না। পরের দিন সেই ছাত্র-তিনজন অধ্যাপক ওটেনের জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ তিনি আসতে পারেন না। এই অন্যায়ের প্রতিকারের কোন আশা দেখতে না পেয়ে সমস্ত ক্লাস চূড়ান্ত অসন্তুষ্ট থাকে। এই তীব্র অসন্তোষ এত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে যে, সমস্ত ছাত্র এই অবিচারের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত ক্লাস করতে অস্বীকার করে। ধর্মঘট দু-দিন স্থায়ী হয়। তৃতীয় দিনে মিঃ ওটেন ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন। অপ্রীতিকর ঘটনাটির পরিসমাপ্তি ঘটান।